কুটিরে তিনদিন

বহুদিন ধরেই শখ ছিলো কয়েকটা দিন নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত কোন একটি কটেজে কাটাবো। নানান কারণে পরিকল্পনা বাস্ড় বায়িত হচ্ছিলো না। পরিশেষে সমস্ড় বাধা-বিপত্তি পায়ে ঠেলে খুঁজে পেতে ‘থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস রিজিয়ন’ (1000 Islands Region) এ একটি চার বেডরুমের কটেজ পাওয়া গেলো।

উত্তর আমেরিকাতে গ্রীষ্ম আসে ভয়ানক আনন্দ ও উত্তেজনা নিয়ে। ভয়াবহ শীতের পর গরমের আমেজ যেন সবাইকে পাগল করে দেয়। সেই পাগলামির নমুনা পেলাম কটেজ খুঁজতে গিয়ে। হাজার হাজার কটেজে কানাডার পূর্বাঞ্চল পরিপূর্ণ, কিন্তু কোনটাই ফাঁকা নেই। জানলাম আগ্রহী মানুষেরা ছয় মাস থেকে এক বছর আগেও নাকি সেগুলি ভাড়া করে রাখে গ্রীষ্মের দুই-এক সপ্তাহের জন্য। কারণটা বোঝা বিশেষ কঠিন নয়। গরমের সময়েই স্কুল দুই মাস বন্ধ থাকে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যাবার এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর হয় না। অবশ্য আবহাওয়ারও কিছুটা ভুমিকা আছে। শরতে হঠাৎ করেই এমন ঠান্ডা বাতাস শুরু হয়ে যায় যে বাইরে বেড়ানোর আগ্রহ অনেকেই হারিয়ে ফেলে।

চার বেডরুমের কটেজটি তিন দিনের জন্য ফাঁকা পেয়ে আমি মনে মনে যারপরনাই সন্তুষ্টি অনুভব করলাম। তবে এতো বড় একটি কটেজে একাকী বেড়াতে যাবার আনন্দ সামান্যই। আমি বেশ কয়েকজন আগ্রহী বন্ধু পরিবারের সাথে আলাপ করলাম। পূর্বে বিভিন্ন আলাপে তারা তাদের গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করেছিল। দূর্ভাগ্যবশতঃ দুই মাস পরে কার কি পরিস্থিতি থাকবে তা নিয়ে তাদের সবাইকেই অল্প-বিস্ড়র চিন্ড়িত মনে হলো। তাদের কারোরই ধারণা ছিলো না

কটেজ ভাড়া করবার ব্যাপারটা মাস দু'য়েক আগেই সারতে হবে। বাধ্য হয়ে আমি কটেজটি ছেড়ে দিলাম। মনটা বেশ খারাপ হলো। বন্ধুদের প্রতি যথেষ্ট নাখোশ হলাম।

সপ্তাহ খানেক পরে খানিকটা ঘটনাক্রমেই সালেহ, আমার নিউইয়র্ক নিবাসী বন্ধু, আমার কাছে কটেজে যাবার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলো। প্রায় একই সময়ে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ একটি তরুণ পরিবারও সঙ্গী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। ছেলেটির নাম সুজন, মেয়েটি সুনয়না। প্রেম করে বছর দুয়েক হলো তারা বিয়ে করেছে। সুজন কানাডা আসার পর সুনয়নাও চলে এসেছে। সুজন মাটির মানুষ, সুনয়না কিঞ্চিৎ খামখেয়ালি। তারা দু'জনাই আমার চেয়ে আট-ন বছরের ছোট তো হবেই। সালেহ এবং সুজনদের আগ্রহ আমাকে পুনরায় আশান্বিত করে তুললো। আবার খোঁজ খবর শুরু হলো। পরিশেষে পাওয়া গেলো 'থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস' এ একটি ফ্লোটিং শ্যালে (floating chalet) - ভাসমান কটেজ। তিন বেডরুম, জলমুখী প্রশস্ত ডেক, ঠিক সেইন্ট লরেন্স নদীর পাদপ্রান্তে। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে একেবারে পানির উপরে বসবাস করতে খানিকটা দ্বিধা হলেও অন্য কোন উপায় না থাকায় রাজি হয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ তিন দিনের জন্য সেটি ভাড়া করে ফেললাম। সেদিনই মেইলে চেক পাঠাতে হলো। মালিক টাকা পাওয়ার পর কথা ফাইনাল হবে। আট দিন পর মালিক ই-মেইল পাঠিয়ে তার কনফরমেশন জানালো। আমরা সবাই উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে লাগলাম। দুই মাসের অপেক্ষা ভয়ানক দীর্ঘ মনে হলো।

গ্রীষ্মের প্রায় শেষে, এক উজ্জ্বল সকালে আমরা 'থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস' এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সুজনদের গাড়ী নেই। আমরা ওদেরকে তুলে নিলাম। কলহাস্যে, সতেজ আলাপে গাড়ীর ভেতরের আবহাওয়া মুহূর্তে উষ্ণ হয়ে উঠলো।

‘থাউজ্যান্ড আইল্যান্স’ এলাকাটি সেন্ট লরেন্স নদী ও লেক ওন্টারিওর পূর্ব তীর জুড়ে অবস্থিত, কিছু অংশ কানাডায়, কিছু আমেরিকাতে। সহস্র ছোট বড় দ্বীপে পূর্ন এই জলাঞ্চলটি। সেই কারণেই এলাকাটির এমন চমৎকার নাম ‘থাউজ্যান্ড আইল্যান্স’ - হাজারো দ্বীপ। কানাডার দিকে কিংস্টন থেকে কর্নওয়াল পর্যন্ড় তার বিস্তৃতি। আমেরিকার দিকে ওসওয়েগা থেকে ম্যাসেনা পর্যন্ড়। দুনিয়াব্যাপি খ্যাতি এই এলাকাটির। পৃথিবীর নানান প্রান্ড় থেকে টুরিস্টরা আসে এই ‘হাজারো দ্বীপের’ অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে।

আমাদের কটেজটি কারডিনাল শহরে। কিংস্টন থেকে আরো ১২০ কিলোমিটার পূর্বে। কারডিনাল পর্যন্ড় হাইওয়ে ৪০১ ধরে চলে যাওয়া যায়। শহরে পৌঁছে স্থানীয় রুট ২ নিতে হবে। আমরা প্রথমে প্রেসকট থেমে কটেজের মালিকের সাথে দেখা করলাম। স্বামী ও স্ত্রী দু’জনে তাদের মোট চারটি কটেজ বছর জুড়ে ভাড়া দেয়। তাদের চমৎকার বসতবাড়ি দেখে বোঝা গেলো তাদের ভালোই চলে। লোকটি বাসায় ছিলো না। মহিলা তার ছয় মাসের ছোট মেয়েকে নিয়ে তার নিজস্ব ভ্যানে আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। প্রেসকট থেকে কারডিনাল দশ-পনেরো মিনিটের পথ। ভাসমান কটেজগুলি রুট ২ এর উপরেই, একটি বাঁকানো নুড়ি বাঁধানো পথ ধরে প্রায় ফুট পঞ্চাশেক নীচে নামতে হয়। মূল নদীর একটি ছোট্ট প্রশাখায় ভাসমান কংক্রিটের বেসের উপরে ছিমছাম তিনটি বাসা। মাঝের বাসাটি আমাদের। অন্য দুটিতে স্থায়ী বাসিন্দা আছে। প্রশস্ড় ডেকে দাঁড়িয়ে সামনে তাকাতেই মনটা ভরে গেলো। নদীর এই প্রশাখাটি বড় জোর দেড়শ’ ফুট চওড়া। একটি ক্রমশ চিকণ হয়ে যাওয়া ভূমি মূল নদী থেকে আমাদেরকে পৃথক করেছে। বেশ সুন্দর একটি পার্ক তৈরি করা হয়েছে সেই ভূমিটুকুর উপরে। সারি সারি গাছপালার মাঝ দিয়ে মেঠো পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে অনেকখানি দূরে।

মালিকের স্ত্রী, কোরি, আমাদেরকে বাসার সবকিছু দেখিয়ে, চাবি গছিয়ে দিয়ে চলে গেলো। তার মেয়েটি কান্নাকাটি শুর করেছে। আমি ঘড়ি দেখলাম। বিকাল তিনটা। সালেহ স্ত্রী রেখা ও নয়-দশ বছরের ছেলে জসিমকে নিয়ে সরাসরি নিউইয়র্ক থেকে আসছে। তাদের অনেক সকালে রওনা দেবার কথা। তারপরও বিকেল চারটার আগে পৌঁছাতে পারবে কিনা সন্দেহ। আমি দোতালার একটি বেডর ম তাদের জন্য রেখে অন্যটি দখল করলাম। সুজনদেরকে চালান করলাম নীচতলার বেডর মে। তাদের তর ণ হৃদয়ে অকস্মাৎ আবেগের সঞ্চার হলে আমাদের উপস্থিতি নিয়ে তাদেরকে বিব্রত হতে হবে না।

সবাই বোচকা-বুচকি খুলে আগামী তিনটা দিন আলস্যভরে কাটানোর সংকল্প নিয়ে জেঁকে হাত পা ছড়িয়ে বসলাম। বিশাল প্যাটিও আমব্রেলার (Patio umbrella) নীচে গোল টেবিল ঘিরে সার বেঁধে চেয়ার বসানো। শিলি দ্র তহাতে চা-নাস্ড়া বানিয়ে টেবিলে পরিবেশনা করতেই ফুরফুরে হৃদয় এবার গুনগুন করে গান গাইতে শুর করলো।

বিকট ধমকানির শব্দে সঙ্গীতে ব্যাঘাত হলো। রেখা ভাবীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ চিনতে দেরি হলো না। সালেহ ও জসিম কানে আঙ্গুল দিয়ে ডেকে পদার্পণ করলো, রেখা ভাবী ঠিক তাদের পিছু পিছু। - "সেই কখন থেকে চরকির মতো ঘুরছে। কতবার বললাম কাউকে জিজ্ঞেস করো। নতুন জায়গা, চেনা জানা কেউ নেই। না, তাতে ওনার বেইজ্জতি হবে। নরাধম। গত আধঘণ্টা ধরে অকারণে গাড়ীর মধ্যে পড়ে মরছি। আমার মামার সাথে বের হলে জীবনে কখনো এমন হতো না। এইসব গবেটদের সাথে রাস্ড়ায় বের হওয়াই ভুল।"

আমি হাসিমুখে অভিবাদন জানাই - "কেমন আছেন ভাবী? জায়গাটা দেখেছেন? মারাত্মক না?"

রেখা মুখ কুঁচকালো। - "ভালোই তো দেখাচ্ছে। কিন্তু বাড়িঘর দুলছে কেন? পানির উপরে ভাসছে নাকি? আমি তো ভাবলাম মাটির সাথে আটকে দেয়া। ঝড়-টড় হলে মাঝ দরিয়ায় নিয়ে ফেলবে না তো? ভাই, আপনি এই সব আগে কখনো করেছেন ? মামাকে একটা ফোন লাগাবো? মামা বছরে দশবার কটেজে যায়, এইসব তার নখদর্পণে।"

সালেহ ভ্যাংচালো - "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুনিয়ার সবই তোমার মামার নখদর্পণে।"

- "একদম বাজে কথা বলবে না। ফাউ ঘুরিয়ে এনে আবার মুখের উপর কথা বলছো?"

একটি ফেরিবোট প্রচণ্ড শব্দে নদীতে বিকট ঢেউ তুলে ছুটে গেলো। সেই ঢেউয়ের ঝাপটা এসে লাগতে ভাসমান বাসা এপাশ ওপাশ দুলতে লাগলো। রেখা সজোরে সালেহকে জড়িয়ে ধরলো – "উল্টে যাবে নাকি গো? শক্ত করে ধরো আমাকে। আমি সাঁতার জানি না।"

একটা হাসির রোল উঠলো। রেখা ঠোঁট বাঁকালো। "এটা হাসির কিছু না। চারদিকে এতো পানি দেখে আমার কেমন নার্ভাস লাগছে।"

চা - নাস্ড়া খেয়ে রেখা কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হলো। জসিম এইবার আমাকে চেপে ধরলো - "চলো আঙ্কেল, ফিশিং করি। বিগ বিগ ফিশ ধরতে হবে।"

উত্তম প্রস্ড়াব। আমাকে মাছ ধরবার সরঞ্জামাদি বের করতে দেখে সুজনও তার সদ্যক্রীত ছিপ বের করলো। আমার মৎস্য সংক্রান্ড় আগ্রহ দেখে সেও বিশেষ রকম অনুপ্রানিত হয়ে এই অপকর্মটি করে ফেলেছে। সুনয়নার ব্যাপারটা বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না। সে আমাকে দেখলেই নাকে হাত দেয় - "আপনার সর্বাংগে মাছের গন্ধ।"

সুজনের কপালে দুঃখ আছে!

স্থানীয় একটি ক্ষুদ্র ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে দুই বাক্স কেঁচো কিনে এনে আমরা কাজে লেগে গেলাম। ডেকের উপর থেকে পানিতে ছিপ ফেললাম। জসিমের মাছ ধরা দেখে জাকিরও উৎসাহ দেখা দিলো। তার জন্যে ছোটদের ছিপ কেনাই ছিলো। সব ঠিক ঠাক করে, কেঁচো লাগিয়ে বড়শি পানিতে ফেলে ছিপ তার হাতে ধরিয়ে দিলাম। - "টান দিলে বলবি।"

তার খুশী আর ধরে না। এমন ভয়ানক দায়িত্বপূর্ণ একটা কাজ তাকে দেয়া হয়েছে, তার বিশ্বাসই হচ্ছে না। বিধাতার কি লিখন। তার বড়শিতেই প্রথম মাছটা পড়লো। বেশ বড়সড় একটি সানফিশ, পোয়াখানেকতো হবেই। ছিপে টান পড়তে বেচারি চিৎকার শুর" করে দিল। আমি মাছ ডেকে তুলে ছিপ জাকির হাতে ধরিয়ে দিয়ে পটাপট ছবি তুলে ফেললাম। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে বালতি ভরে গেলো 'সানফিশ' এ। সালেহও আমাদের দলে এসে ভিড়লো।

শেষ বিকালের চমৎকার হিমেল বাতাস মোলায়েম পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। হালকা ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে আমাদের পাটাতন। ডেকের রেলিংয়ের সাথে বাঁধা কাঠের নৌকাটা দেখে লোভ হচ্ছে। কিন্তু কেউই ভালো সাঁতার জানি না। সাথে লাইফ জ্যাকেট দিয়েছে কিন্তু তবুও সাহস হচ্ছে না। নৌকা উল্টে পাল্টে গেলে কি হতে কি হয়। কটেজে একটু ফুর্তি করতে এসে জীবন বিসর্জন দিতে চাই না।

মাছ ধরে এমন দার"ন সন্ধ্যাটা কাটানোর আগ্রহ মেয়েদের মধ্যে দেখা গেলো না। তারা আমাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি আপত্তিজনক মন্ড়ব্য করে হাঁটতে বেরিয়ে গেলো। গন্ড়ব্য সম্মুখের দ্বীপের মতো ছোট পার্কটা। আমাদের তিনদিকেই পানি ঘিরে থাকায় তাদেরকে উৎরাই বেয়ে উঠে, প্রধান সড়ক ধরে খানিকটা হেঁটে তবে আবার চড়াই বেয়ে নামতে হবে। তাদেরকে যেতে দেখে আমরা সকলেই আনন্দিত হয়ে উঠলাম। মাছুয়াদেরকে মাছের গন্ধ নিয়ে কটুক্তি করা মোটেই শোভন কাজ নয়। খাবার সময়তো বাছ বিচার করবে না।

সেদিন রাতে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য সাবাড় করে অনেক রাত পর্যন্ড় আড্ডা পিটিয়ে সবাই যখন বিছানায় গেলো, আমি তখন ছিপ নিয়ে আবার বের হলাম। আমাদের শ্যালে থেকে পঞ্চাশ - ষাট ফুট দুরে খাড়া টিলাটার ঠিক নীচের শান্ড় পানির এলাকাটা দেখে পাইক মাছের আখড়া মনে হচ্ছিলো। মাছটা বাইন মাছের বড় ভাই জাতীয়, খেতে খুবই মজা। দু একটা ধরতে পারলে মনটা ভালো হয়ে যাবে। আমি উপরের রাস্ড়ায় জ্বলে থাকা একটি ল্যাম্প পোস্টের ক্ষীণ আলোতে একাকি প্রায় ঘন্টাখানেক খুব চেষ্টা করলাম - বড়শি অনেকখানি দূরে পানিতে ছুড়ে ফেলি স্পুন (spoon) লাগিয়ে, ধীরে ধীরে রিল (reel) করে নিয়ে আসি। কোন লাভ হলো না। রাত একটার দিকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেলাম।

পরদিন ভোরে উঠে আবার বের হলাম। ভোরবেলা, সূর্য উঠার ঠিক আগে হচ্ছে মাছ ধরার উৎকৃষ্ট সময়। টরোন্টোতে থাকতে সেই সুযোগ কখনই হয় না। সবচেয়ে নিকটবর্তি মাছ ধরবার ভালো লেক আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার পথ। আমি নদীর তীর বরাবর হাঁটতে থাকি এবং আমার প্রচেষ্টা চালাতে থাকি। ঘন্টাখানেক পরে আমার সহিষ্ণুতা পুরস্কৃত হলো। একটা ৩-৪ পাউন্ডের পাইক মাছ পেলাম। পনেরো মিনিট পরে আরেকটি। চমৎকার! এদিকে শুনেছি বেশ বড় বড় ব্যাস মাছ আছে। তারা এক নম্বর স্পোর্টস ফিশ (sports fish)। সূর্য উঠবার ঠিক আগে আগে চারদিকে তাদের লম্ফ ঝম্ফ দেখে তাদের উপস্থিতির প্রমাণ পেলাম। কিন্তু ধরতে পারলাম না একটাও। তা হোক, যা পেয়েছি সেটাই বা মন্দ কি? মাছ দু'খানা হাতে ঝুলিয়ে বুক ফুলিয়ে দেড় কিলোমিটার পথ হেঁটে কটেজে ফিরলাম। কেউ তখনো বিছানা ছাড়েনি। আমি মাছগুলোকে রশিতে বেঁধে ডেকের গ্রিলের সাথে ঝুলিয়ে পানিতে ছেড়ে দিলাম। সবাইকে দেখিয়ে দু একটা ছবি না তুললে এই কৃতিত্বের প্রকৃত আনন্দটা কোথায়?

যদিও আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো এখানে এসে একটু হাত পা খুলে কয়েকটা দিন কাটানো কিন্তু দেখা গেলো নাস্ড়ার পর্ব সারা হতে সবাই বাইরে

যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ‘থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড’ এলাকাটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্যই বিখ্যাত নয়, তার ঐতিহাসিক মূল্যও প্রচুর। আমেরিকান রেভলুশনের সময় এবং পরে এই এলাকাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। আমি আসবার আগেই স্থানীয় দর্শনীয় কয়েকটি স্থানের খবর নিয়ে এসেছিলাম। যদিও আমার ইচ্ছা ছিলো সারাদিন মৎস্য শিকার করে কাটানো, তবুও গণমতের বিরুদ্ধে যাবার সাহস পেলাম না। আমার স্ত্রী সাহেবানের মুখ একেবারে মধুর মতো না হলেও, রেখার তুলনায় নস্যি। রেখাকে কোন সুযোগ দিতে আমি রাজী নই। বিশেষ করে তার মামার কথা তুললেই সালেহের মতো আমারও শরীর চুলকাতে শুরু করে।

আমরা প্রথমে গেলাম প্রেসকটে ব্যাটল অব উইন্ডমিল (battle of windmill) এলাকাটি পরিদর্শন করতে। প্রেসকটে এই এলাকা বিখ্যাত ফোর্ট ওয়েলিংটন এর জন্য। ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত এই দূর্গটি শহরের প্রায় কেন্দ্রে অবস্থিত। সেখানে আমরা যাই পরে। কিন্তু প্রেসকটের ঐতিহাসিক মূল্য বোঝাতে হলে সমসাময়িক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা না দিলে কোন কিছুই বলা হয় না।

১৭৭৬ সালে জুলাইয়ের ৪ তারিখে ম্যাসাচুসেটসের অন্তর্গত বোস্টনে কংগ্রেস আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রাম অবশ্য শুরু হয়েছিলো তার আগেই। জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন কন্টিনেন্টাল আর্মির (Continetal Army) কমান্ডার ইন চিফ (Commander in Chief)। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ চলে পরবর্তি সাত বছর। ১৭৮৩ সালে ব্রিটিশ বাহিনী আমেরিকা ত্যাগ করে। তাদের সাথে সাথে নতুন ভূমিতে পাড়ি জমায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগতরা। ১৭৮৪ সালের গোড়ার দিকে তারা সেন্ট লরেন্স নদীর পারে অবস্থিত প্রেসকটে একত্রীভূত হয়। নদীর ওপারে আমেরিকা, এপারে কানাডা। সেন্ট লরেন্স নদীর ভূমিকা অসাধারণ। গ্রেট লেক্স্ - লেক অন্টারিও, লেক ইরি, লেক হিউরন, লেক মিসিগান ও লেক সুপিরিয়র এর সাথে মন্ট্রিলের যোগাযোগের জন্য এবং মালপত্র পরিবহনের জন্য

এই নদীপথটির ব্যবহার অপরিহার্য। যে কারণে তাদের আশংকা ছিলো আমেরিকানরা হয়তো সুযোগ পেলেই কানাডিয়ান পোর্টগুলি আক্রমণ করে দখল করে নেবার চেষ্টা করতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ জাহাজগুলির এই পথে চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের পক্ষে সমরাস্ত্র ও অন্যান্য মালামাল দুরবর্তি এলাকাগুলোতে চালান করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় মিলিশিয়ারা দু'টি দালান দখল করে একটি সাময়িক দূর্গ তৈরী করে। পরবর্তীতে সেখানে দু'টি নাইন-পাউন্ডার (9-pounder) কামানও এনে বসানো হয়। পরে, ১৮১২ সালে নর্থ আমেরিকায় ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডার স্যার জর্জ প্রিভস্ট সেখানে একটি পুরোদস্ড়র সামরিক দূর্গ স্থাপনের আদেশ দেন। সেখান থেকেই ফোর্ট ওয়েলিংটনের গোড়াপত্তন।

'ব্যাটল অব উইস্নমিল' পরিদর্শনে গিয়ে প্রশস্ড় সেন্ট লরেন্স নদীর পাথুরে তীরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু একটি লাইট-হাউস দেখে আমরা সকলেই বেশ মোহিত হলাম। ভেতরে সুভেনিরের দোকান। সিঁড়ি বেয়ে একেবারে উপরে উঠে যাওয়া যায়। একটি অল্প বয়স্ক যুবক আমাদেরকে স্বাগত জানালো। কিছু তার মুখে এবং কিছু একটা ভিডিও দেখে বেশ একটা ধারণা পাওয়া গেলো বিখ্যাত 'ব্যাটল অব উইস্নমিল' এর।

প্রতিবেশি আমেরিকা স্বাধীনতা অর্জন করলেও কানাডা ব্রিটিশ কলোনির অংশ হিসাবেই থেকে যায় পরবর্তী কয়েকটা যুগ। কানাডার শাসকগোষ্ঠি ছিলো হাতে গোনা কিছু অভিজাত পরিবার। কিন্তু ধীরে ধীরে আরো গণমুখী শাসনতন্ত্রের দাবি জোরদার হচ্ছিলো। ১৮৩৭ সালে এইসব দাবি এবং অসন্ড়োষ থেকে একটি বিদ্রোহেরও সূচনা হয়। ব্রিটিশ আর্মির হাতে তারা অবশ্য সহজেই পরাভূত হয় এবং ওপারে পালিয়ে যায়। ১৮৩৮ সালে এই বিদ্রোহীরা এবং তাদের বেশ কিছু আমেরিকান সমর্থকরা সেন্ট লরেন্স নদীর ওপারে জোট বাঁধে এবং নভেম্বরের ১২ তারিখে প্রেসকট আক্রমণ করে। তারা সংখ্যায় অল্প থাকলেও আচমকা আক্রমণ করে প্রেসকট উইন্ডমিল [বর্তমানে লাইটহাউস] এবং কিছু স্থানীয় দালান কোঠা

দখল করে নেয়। তাদের ধারণা ছিলো স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের সাথে হাত মেলাবে। কিন্তু বাস্ড়বে তা হলো না। খুব শীঘ্রই ফোর্ট ওয়েলিংটন থেকে ব্রিটিশ সৈনিকরা এসে তাদেরকে পরাভূত করে এবং বন্দী করে। জীবিতদের এগারোজনকে হত্যা করা হয়, ষাটজনকে পাঠানো হয় অস্ট্রেলিয়ায়। যুদ্ধের পর উইন্ডমিলটি আর্মি পোস্ট হিসাবেই ব্যবহৃত হচ্ছিল। ১৮৭২ সালে এটিকে লাইটহাউসে র‍ূপান্ড়রিত করা হয়।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমাদের সম্পূর্ণ দলটা ধীরে ধীরে উপরে উঠলো। ভেতরে ইটের গায়ে এখনো বুলেটের চিহ্ন প্রথিত। তাদের ঐতিহাসিক মূল্যকে ধরে রাখবার জন্যই সেই চিহ্নগুলোকে সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে। একেবারে উপরে উঠতেই সেন্ট লরেন্স নদীর দমবন্ধ করা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এক অপূর্ব ঝলক চোখে পড়লো। সেখানে বেশ কিছু ছবি তুলে আমরা গেলাম ফোর্ট ওয়েলিংটন দেখতে।

স্বাভাবিকভাবেই ঠিক নদীর পাশেই অবস্থিত দূর্গটি। প্রশস্ড় একটি মাঠের মাঝখানে চারদিকে উঁচু করে কাঠের বেড়া দেয়া। শুধুমাত্র সামনের দিকে উঁচু করে মাটির ঢিবিমতো বানানো হয়েছে। সেই ঢিবির উপরে বেশ কয়েকটি কামান বসানো। ভেতরে গার্ডদের থাকার স্থান, সৈনিকদের বসবাসের দালান এবং আরো কয়েকটি ছোটখাটো ঘর। সবুজ ঘাস এবং বিশালকায় বৃক্ষে পরিবেষ্টিত দূর্গের অভ্যন্ড়র দেখে ঝট করেই ভালো লেগে যায়। দূর্গের ভেতরে তর‍ুণ-তর‍ুণীরা সপ্তদশ শতকের পোশাক-আশাক পরে বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছে। বেশ কয়েকজন তর‍ুণ প্রথাগত ব্রিটিশ গার্ডের পোশাকে সেই আমলের রাইফেল হাতে প্রহরায় নিযুক্ত। আকাশে ব্রিটিশ পতাকা পত পত করে উড়ছে। সব কিছু সুচার‍ুভাবে পরিকল্পিত। দেশ-বিদেশ থেকে টুরিস্টরা আসে এই দূর্গ দর্শনে। তাদেরকে বর্তমান থেকে কয়েক শ' বছর পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে এক বিরল অভিজ্ঞতা দেবার জন্যেই এই প্রয়াস। জসিম ও জাকি বন্দুকধারী গার্ডের কাঁধে ঝুলে পড়ে বেশ কয়েকখানি দন্ড় বিকশিত ছবি তুললো। তর‍ুণ অভিনেতাও

তাদের কান্ড দেখে ফিক ফিক করে হেসে উঠলো। মাটির চুলায় একদল তরুণী সেই সময়ের আটার কুকি (cookie) বেক করছিলো। টপাটপ কয়েকটা সাবাড় করে দিলাম। ভালোই লাগলো।

প্রচুর ছবি তুলে যখন আমরা সেখান থেকে বের হলাম তখন বিকেল। সবারই পেট চোঁ চোঁ করছে। পাশেই শহর। রেষ্টুরেন্টের সংখ্যা অতি অল্পই। একটি চাইনিজ বুফে'র দর্শন পেয়ে হৈ চৈ করে ভেতরে ঢুকলাম। অতি শীঘ্রই আমাদের অধিকাংশেরই প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে গিয়ে উদ্বিগ্নতা দেখা দিলো। অধিকাংশ খাবারেই পর্ক (pork) দেয়া। চোর বাছতে গা উজাড় হয়ে যাবার দশা হচ্ছে। সেভাবেই যে যা পারলো খেয়ে নিলো। রাতে ভূরি ভোজন দিলেই চলবে। আমাকে অবশ্য প্রচুর গঞ্জনা সহ্য করতে হলো। অপরাধ এই টুকুই যে আমিই দোকানটা প্রথম দেখেছিলাম। আমার ধর্মভয় অল্পই; কিন্তু ক্ষুধার্ত। আমি পেটপুরে খেলাম।

বিকালে বাসায় ফিরে নৌকাটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সাঁতার যেটুকু জানি তাতে ফুট ত্রিশেক যেতে পারবো। তারপরেই টুপ করে ডুবে যাবো। তবুও সাহসে বুক বেধে লাইফ জ্যাকেটটি শরীরে চাপিয়ে সাবধানে পা রাখলাম পাটাতনে। শিলিও অনেক চিন্ড়াভাবনার পর আমাকে অনুসরণ করলো। জাকির জলভীতি আছে। সে নৌকার ধারে কাছেও এলো না। দু'জনে দুই বৈঠা নিয়ে শম্বুক গতিতে নদীর তীরের খুব কাছ দিয়ে ঘুরতে লাগলাম। কয়েকবার তাল-বেতাল হয়ে আমাদের দুজনারই যেন বৈঠা চালানোতে হাত খুলে গেলো। শীঘ্রই আবিষ্কার করলাম এই শাখা নদীর মাঝখানে পানির গভীরতা বেশী থাকলেও তীরের দিকে চলিশ-পঞ্চাশ ফুট এলাকার গভীরতা চার-পাঁচ ফুটের বেশী হবে না। নৌকা উল্টে গেলেও পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে। আমাদের মুখে হাসি ফুটলো। বেশ খানিকটা দূরে কয়েকটা গাছের ছায়ায় এক ঝাঁক গোলাকৃতি শাপলা পাতার মাঝে একটি ফুল ফুটে আছে। আমরা প্রবল উৎসাহ নিয়ে ফুলটাকে তুললাম।

আমাদের এই রোমান্টিক নৌবিহার দেখে সালেহের বেশ একটা আগ্রহ দেখা দিলো। রেখা তার প্রস্ড়াবে মুখ ঝামটা দিলো - "বাজে কথা বলো না। সাঁতারের স জানি না দুজনার একজনও। নৌকা ডুবলে জীবন শেষ। ঐসব 'লাইফ জ্যাকেট' এ কাজ হয় নাকি। থাকতো মামা, চোখ বুজে যেতাম। ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছেন সাঁতরে -----।"

সালেহ বিরস মুখে বললো - "হ্যাঁ, ইংলিশ চ্যানেলের পানিতে পা ডুবিয়েছিলেন একবার।"

"বাজে কথা বলবে না। একদম না। আমার মামার নখের যুগ্যি হতে পারবে তুমি ----- "

সুজন ও সুনয়নার নৌকায় চড়বার কোন আগ্রহ দেখা গেলো না। দুজনকেই ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে নৌকাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমি আর জোরাজুরি করলাম না। একটু পরেই আবিষ্কার করলাম তারা দু'জনে হাত ধরে নিকটবর্তি টিলাটার উপরে একটু নির্জনতা খুঁজছে। মাত্র একদিনেই জসিম তাদের ভয়ানক নেওটা হয়ে গেছে। সে আতিপাতি করে চারদিক খুঁজতে খুঁজতে তাদের দু'জনকে আবিষ্কার করলো। আমার নিষেধে কোন কর্নপাত না করে ছুটলো সে। তার সঙ্গ নিলো জাকি। এই পিচ্চিগুলোর যদি কোন কান্ডজ্ঞান থাকে।

রাতে গরুর পাজরের বারবিকিউ (BBQ) দিয়ে মহা ভুরিভোজন হলো। সাথে শিলির হাতে বানানো পিজা। এই জাতীয় রান্নায় তার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। অনেকেই ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকে শিখবার জন্য।

পরদিন আমরা গেলাম নিকটবর্তী শহর ইরোকুয়া (Iroquois) এ সি-লক (sealock) দেখতে। গ্রেট লেক এর অন্তর্গত একেকটি লেকের পানির উচ্চতা সি লেভেল থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের। সেইন্ট লরেন্স নদীর থেকে সেগুলি পৃথক। নৌচলাচলের জন্য প্রচুর অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করে বেশ কিছু লক তৈরী করেছে কানাডিয়ান সরকার। প্রতিটি লেকে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে চলাচলকারী জাহাজ বা বোটকে উপরে নীচে করা যায়। সুতরাং কম উচ্চতার

একটি জলবক্ষ থেকে অধিক উচ্চতার জলবক্ষে একটি জলতরীকে পার করবার জন্য পানির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। বিপরীত দিকের জন্য পানির পরিমাণ কমানো হয়। এই লকগুলি থাকাতেই সেইন্ট লরেন্স নদীর সাথে সবগুলি লেকের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

ইরোকু য়ার লকটি অসম্ভব সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। প্রায় শ' খানেক ফুট উঁচু পাহাড়ের উপরে চমৎকার প্রশস্ড় একটা পার্ক। এই পার্কের প্রান্ড়ে অবস্থিত রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে নীচের লকটির পরিপূর্ণ অবয়বটা দেখা যায়। আমরা থাকতে থাকতেই দু'টি জাহাজ লকের চিকণ চ্যানেল দিয়ে খুবই ধীর গতিতে পার হলো। দু'দিকের বিস্ড়ৃত নীল জলরাশি, সবুজ গাছপালায় ছাওয়া আদিগন্ড় তীর এবং রৌদ্রোজ্জ্বল নীলাভ আকাশ আমাদের সবারই মন কেড়ে নিলো। লক্ষ্য করলাম সুজন ও সুনয়না এক সুযোগে পার্কের পার্শ্ববর্তী একটি বিশাল কবরস্থান পরিদর্শনে চলে গেছে। তাদের পিছু পিছু ছুটলো জসিম ও তার ছায়াসংগী জাকি।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মনটা খারাপ হলো। আজই দুপুরের মধ্যে বাক্স পেটরা গুছিয়ে আমাদেরকে যে যার ঘরে ফিরতে হবে। কেমন করে যেন ক'টা দিন কেটে গেলো টেরও পাই নি। সবারই খারাপ লাগছে, বুঝলাম। দৈনন্দিন জীবনের সহস্র ঝামেলা পেছনে ফেলে এসে এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে সময় কাটানোর চেয়ে তৃপ্তকর অভিজ্ঞতা আর কি হতে পারে? নাস্ড়র পর সালেহ্ নৌকায় উঠবার প্রস্ড়াব দিতে সবাইকে অবাক করে দিয়ে রাজী হয়ে গেলো রেখা। বোঝা গেলো তার হৃদয়েও বিদায়ের ব্যথাতুর সংগীত বেজে উঠেছে। যাবার আগে যেটুকু আনন্দ নেয়া যায়। সালেহের হাতে বৈঠা। রেখা আগেই বলেছে সে নৌকায় উঠে আঙ্গুল নাড়তেই রাজি নয়। তার আড়ষ্ট ভঙ্গি দেখে কারণটা বুঝতে কারো অসুবিধা হলো না। শিলি সাধারণত খুব হিসেব করে ঠান্ডা মশকরা করে। সেও খিল খিল করে হাসতে হাসতে বললো - "রেখা ভাবী, আপনার কাঁপুনিতেই নৌকা ডুবে যাবে।"

রেখা ভীতচকিত চাহনি দিলো। কোন কথা বলবার সাহস হলো না। সালেহ সাহসী মুখে বৈঠায় টান দিলো। নৌকা মোলায়েম গতিতে পানির বুক চিরে এগিয়ে গেলো। প্রথম কয়েকটা মিনিট ভালোই চললো সব কিছু। কিন্তু উত্তেজনার বশে জোরে বৈঠা চালাতে গিয়েই সর্বনাশ করলো সালেহ। স্রোতের টানে নৌকা দুলতে শুরু করতেই চিৎকার করে বিপরীত দিকে ওজন চাপানোর চেষ্টা করলো রেখা। সালেহ ও তার সম্মিলিত ওজনে নৌকা কাত হয়ে পড়লো। স্লো মোশন ছবির মতো দু'জনেই ধপাস করে পড়লো পানিতে। নৌকা অল্পের জন্য উল্টালো না। আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। তাদের দু'জনকে কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে হাতাহাতি করতে দেখে আমাদের সবারই যে হৃদয় প্রফুল হয়ে উঠবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? এতো দূর থেকেও রেখার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের খিস্ড়ি শুনতে পাচ্ছি - "ছি ছি, ইচ্ছে করে পানিতে ফেললে? মানুষজনের সামনে এমন হেনস্থা করলে? লজ্জা করছে না হাসতে? উজবুক কোথাকার! বাসায় ফিরেই মামাকে ফোন করবো ------- "

আমরা আরেক দফা হাসিতে ফেটে পড়ি।

দুপুরের খাবার খেয়ে মালিকের বাসায় কটেজের চাবি সোপর্দ করে রাস্ড়ায় নামলাম আমরা। সালেহরা থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড বর্ডার দিয়ে আমেরিকা ঢুকে যাবে, আমরা ফিরে যাবো টরোন্টোতে। বিদায়ের সময় সবাই হাসিমুখে হাত নাড়লাম।

হাইওয়েতে উঠেই গাড়ী ছুটিয়ে দিলাম দুর্বার বেগে। আজ রোববার, উইক এন্ড যারা বেড়াতে বেরিয়েছিলো টরোন্টো থেকে তারা সবাই ফিরতে শুরু করবে। খুব শীঘ্রই ভীড় হয়ে যাবে রাস্ড়ায়। তিন ঘণ্টার পথ পাঁচ ঘন্টা লাগবে। ভীড় বাড়ার আগেই পৌঁছে যেতে চাই। পিছে পড়ে থাকলো চমৎকার এক টুকরো স্মৃতি।